কবুতর পালন

ভূমিকা

পৃথিবীতে প্রায় ১২০ জাতের কবুতর পাওয়া যায়। বাংলাদেশে প্রায় ২০ প্রকার কবুতর রয়েছে। এগুলো কোনো নির্দিষ্ট জাতের নয়। বাংলাদেশের সর্বত্র এ সকল কবুতর রয়েছে। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে সাধারণত এরা চরে বেড়ায়। বাংলাদেশের জলবায়ু এবং বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র কবুতর পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। পূর্বে কবুতরকে সংবাদ বাহক, খেলার পাখি হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এটি পরিবারের পুষ্টি সরবরাহ, সমৃদ্ধি, শোভাবর্ধনকারী এবং বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের সুষ্ঠু পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রতিপালন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা যায়।

কবুতরের জাত

(১) মাংস উৎপাদনকারী কবুতর	(২) রেসিং কবুতর	(৩) ফ্লাইং কবুতর	(৪)শোভাবর্ধনকারী (ওরনামেন্টাল) কবুতর (৫) দেশী কবুতর	(১)মাংস উৎপাদনকারী কবুতর
(ক) কিং- সাদা, কালো, সিলভার, হলুদ ও নীল (খ) কারনিউ (গ) মনডেইন সুইস, ফ্রেন্স (ঘ) আমেরিকান জায়ান্ট হোমার (ঙ) রাস্ট	(ক) রেসিং হোমার (খ) হর্স ম্যান	(ক) বার্মিংহাম রোলার (খ) ফ্লাইং টিপলার/ ফ্লাইং হোমার (গ) থাম্বলার (ঘ) কিউমুলেট (ঙ) হর্স ম্যান	(ক) মালটেজ (খ) ক্যারিয়ার (গ) হোয়াইট ফাউন্টেল (ঘ) টিম্বলার (ঙ) প্লোটারস (চ) নান্স	(ক) সিরাজী (খ) জালালী (গ) বাংলা (ঘ) গিরিবাজ (ঙ) লোটন (চ) বোম্বাই (ছ) গোবিন্দ



কবুতর পালন এলাকা : কবুতর বাংলাদেশের সর্বত্র পালন হয়ে থাকে তবে যে সকল এলাকাতে অধিক পরিমাণ কবুতর পালন করা হয়ে থাকে সেগুলো হলো ঢাকা, ঝিনাইদহ, পটুয়াখালী, বরগুনা, কক্সবাজার, বান্দরবান, রংপুর ও ময়মনসিংহ।

কবুতর পালনের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(ক)	প্রাপ্ত বয়স্ক কবুতরের দৈহিক ওজন (জাতভেদে)	: ২৫০-৮০০ গ্রাম
(খ)	প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সময়কাল	: ৫-৬ মাস
(গ)	কবুতর প্রতিবার ডিম দেয়	: ১ জোড়া
(ঘ)	গড়ে ডিম উৎপাদন	: ১০.৪৩ জোড়া প্রতি বছর
(ঙ)	হ্যাচাবিলিটি	: ৮৮.৫৪%
(চ)	বাচ্চা উৎপাদনের বয়সকাল	: ৫-৬ বছর
(ছ)	বাচ্চার চোখ ফোটে	: ৪-৫ দিনে
(জ)	বাচ্চা ফোটার জন্য ডিমে তা দেয়া	: ১৭-১৯ দিন
(ঝ)	পালক গজানোর সময়কাল	: ১০-১২ দিনে
(ঞ)	পাখা এবং পা শক্ত হয়	: ১৯-২০ দিনে
(ট)	বাজারজাতকরণের বয়স	: ২৮-৩০ দিন
(ঠ)	দেহের তাপমাত্রা	: ১০৭-৬০ ফাঃ
(ড)	হৃদস্পন্দন	: ১২৮-১৪০ বার/মিনিট
(ঢ)	জীবনকাল	: ১৫-২০ বছর

* প্রথম ডিম দেয়ার প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় ডিম দেয়।

কবুতর পালনের সুবিধা এবং অসুবিধা

সুবিধাসমূহ

(ক) বিনিয়োগ কম
(খ) বেকার যুবক এবং দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের উপায়
(গ) শিক্ষিত লোকও বাণিজ্যিকভিত্তিতে খামার করে আয় বর্ধন করতে পারে।
(ঘ) সংক্ষিপ্ত প্রজননকাল
(ঙ) রোগবালাই কম
(চ) অল্প জায়গায় পালন করা যায়
(ছ) অল্প খাদ্যের প্রয়োজন হয়
(জ) প্রতিপালন অত্যন্ত সহজ
(ঝ) পরিবেশ বান্ধব, ভারসাম্যতা বজায়কারী এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য
(ঞ) মাংস সুস্বাদু, পুষ্টিকর, সহজে পাচ্য এবং প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের উৎস
(ট) মল জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করা যায়

অসুবিধাসমূহ

(ক) পালন বিষয়ক কারিগরি জ্ঞানের অভাব
(খ) দেশী বা বিদেশী জাতের কবুতর কেনার বিশ্বস্ত উৎসের অভাব
(গ) কবুতর ক্রয় বা বিক্রয় করার ভালো স্থানের অভাব
(ঘ) কবুতর প্রতিপালন সংক্রান্ত গবেষণা ফলাফলের অভাব
(ঙ) জাতীয়ভাবে বাণিজ্যিকভিত্তিতে কবুতর পালন এবং উৎপাদনের অভাব

কবুতর চেনার উপায়

স্ত্রী এবং পুরুষ কবুতর চেনা বেশ কঠিন। তবে দীর্ঘদিন অবলোকনের পর চেনা সহজ হয়। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে স্ত্রী এবং পুরুষ কবুতরকে পৃথক করা যায়। যেমন-

পুরুষ কবুতরঃ তুলনামূলকভাবে আকারে বড়, চঞ্চল, দেহ চাকচিক্যপূর্ণ, মলদ্বারে উচু মাংসল অংশ থাকে, স্ত্রী কবুতরকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে ডাকে, ঠোঁট সামনের দিকে টানলে গলা নিজের দিকে নেয়ার চেষ্টা করে।

স্ত্রী কবুতরঃ আকারে ছোট, শান্ত এবং নমনীয় প্রকৃতির, মলদ্বারে উচু মাংসল অংশ থাকে না, এরা ঘুরে ঘুরে ডাকে না এবং ঠোঁট সামনের দিকে টানলে চুপ করে থাকে।

খামারের জন্য কবুতর ক্রয়ের সময় বিবেচ্য বিষয়

(ক) সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন চঞ্চল, সজীব কবুতর কিনতে হবে।
(খ) পালক এবং মলদ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে।
(গ) ঠোঁট বা মুখ দিয়ে কোনো লালা বা মিউকাস পড়বে না।
(ঘ) যে কোনো ধরনের আঘাত মুক্ত হতে হবে।
(ঙ) জোড়া হিসাবে কবুতর কিনতে হবে

কবুতর কিনে বাক্স বা ঝুঁড়িতে করে আনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন বাক্স বা ঝুঁড়িতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের সুযোগ থাকে এবং কবুতর ভালোভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে।

কবুতরের বাসস্থান

স্থান : কবুতরের ঘর হবে উঁচু ভূমিতে, মাটির প্রকৃতি হবে বালুময় এবং উত্তম নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অবস্থান : কবুতরের ঘর মালিক বা খামারির আবাসস্থল থেকে ২০০-৩০০ ফুট দূরে হওয়া উচিত, এতে খামারি সারাক্ষণ যত্ন বা তদারকি করতে পারবেন। পর্যাপ্ত সূর্যালোক এবং বায়ু চলাচল আছে এরূপ স্থানে ঘর তৈরি করতে হবে। ঘর সাধারণত দক্ষিণমুখী হওয়া ভালো।

আকার : একটি খামারের জন্য ৩০-৪০ জোড়া কবুতর আদর্শ। এরূপ ঘরের মাপ হবে ৯ ফুট ×৮.৫ ফুট। কবুতরের খোপ ২-৩ তলাবিশিষ্ট করা যায়। একজোড়া কবুতরের জন্য ২টি খোপ দরকার যাতে করে একটি খোপে ১টি কবুতর ডিমে তা দিলে অন্য খোপে আরেকটি কবুতর থাকতে পারে। এতে ডিমে তা দেয়া সুবিধা হয়। এরূপ খোপের আয়তন প্রতিজোড়া ছোট আকারের কবুতরের জন্য ৩০ সে.মি. ×৩০ সে.মি. ×২০ সে.মি. এবং বড় আকারের কবুতরের জন্য ৫০ সে.মি. ×৫৫ সে.মি. ×৩০ সে.মি.।

ঘরের উচ্চতা : মাটি থেকে ঘরের উচ্চতা ২০-৩৬ ফুট, তবে ২৪ ফুট হওয়া ভালো এবং খাঁচার উচ্চতা ৮-১০ফুট হওয়া ভালো।

ঘর তৈরির উপকরণ : স্বল্প খরচে সহজে তৈরি এবং স্থানান্তরের জন্য কবুতরের ঘর কাঠ দিয়ে তৈরি করা উত্তম। তবে সাধারণত কাঠ, টিন, বাঁশ, খড় ইত্যাদি দিয়ে ঘর তৈরি করা যায়। ঘর তৈরির সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন শিয়াল, বেজি, ইঁদুর, বনবিড়াল ইত্যাদি বন্যপ্রাণী ঘরে ঢুকতে না পারে।

ডিমপাড়ার বাসা

ডিমপাড়ার জন্য কবুতর নিজেরাই বাসা তৈরি করে নেয়। খামারের ভেতরে নরম, শুক খড়-কুটা, শুকনো ঘাস, কচি ঘাসের ডগা জাতীয় দ্রব্যাদি উত্তম। শক্ত কোনো দ্রব্যাদি দিয়ে বাসা তৈরি করে সেখানে ডিম পাড়ার জন্য বসলে কবুতর আঘাত পেতে পারে এবং অনেক সময় ডিম ভেঙেও যেতে পারে। খোপের ভেতর মাটির সরা বসিয়ে রাখলে কবুতর সরাতে ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা ফুটায়।

কবুতরের ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

(ক) দানাদার খাদ্য সরবরাহের পাত্র
(খ) পানি সরবরাহের পাত্র
(গ) খনিজ মিশ্রণ সরবরাহের পাত্র
(ঘ) গোছল করার পাত্র
(ঙ) খোপ বা খাঁচা
(চ) কবুতর বসার জন্য স্ট্যান্ড
(ছ) মগ, বালতি, ঝাঁড়ু- ইত্যাদি
(জ) ডিম পাড়ার বাসা

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

কবুতরের বাচ্চার খাদ্য : ডিম ফোটে বাচ্চা বের হওয়ার কমপক্ষে ৪-৫ দিন পর কবুতরের বাচ্চার চোখ ফুটে। এজন্য এসময়ে বাচ্চাগুলো কোনো দানাদার খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। এ সময় স্ত্রী এবং পুরুষ কবুতর তাদের পাকস্থলী (ক্রপ) থেকে ঘন ক্রিম বা দধির মত নিঃসরণ বের করে যাকে কবুতরের দুধ বলে। এ দুধ অধিক আমিষ, চর্বি এবং খনিজ লবণ সমৃদ্ধ যা খেয়ে কবুতরের বাচ্চা বড় হয় এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত খেতে পারে। বাচ্চাগুলো যখন বড় হতে থাকে তখন স্ত্রী এবং পুরুষ কবুতর উভয়ে দানাদার খাদ্যের সাথে দুধ মিশিয়ে ঠোট দিয়ে বাচ্চাদের খাওয়ায়। বাচ্চা বড় হয়ে নিজে খাদ্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত এভাবে খাবার খাওয়াতে থাকে।

কবুতরের দুধের রাসায়নিক গুণাবলি

পুষ্টি উপাদান	শতকরা পরিমাণ (%)	পুষ্টি উপাদান	শতকরা পরিমাণ (%)
পানি/জলীয় অংশ	৬৪-৮৪	হিস্টিডিন	১.৫২
ক্রুড প্রোটিন	১১-১৮.৮	আইসোলিউসিন	৪.৫০
ফ্যাট	৪.৫-১২.৭	লিউসিন	৮.৯৬
অ্যাশ	০.৮-১.৮	লাইসিন	৫.৮৭
কার্বোহাইড্রেট	০-৬.৪	মিথিওনিন	২.৮৪
ক্যালসিয়াম	০.৮১	মিথিওনিন+সিস্টিন	২.৮৪
পটাশিয়াম	০.৬২	ফিনাইল অ্যালালিন	৩.১৮
ম্যাগনেশিয়াম	০.০৮	টাইরোসিন	৫.৫০
সোডিয়াম	০.৫৪	থিওনিন	৫.৪৯
আরজিনিন	৫.৪৮	ট্রিপটোফেন	২.৮০
লাইসিন	৪.৯৯	ভ্যালিন	৫.৬১
সিরিন	৫.২০	আয়রন	৪২৯

প্রাপ্ত বয়স্ক কবুতরের খাদ্য : কবুতরের জন্য তৈরিকৃত খাদ্য শর্করা, আমিষ, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন, চর্বি এবং খনিজ লবণ সম্পন্ন সুষম খাদ্য হতে হবে। কবুতর দানাদার জাতীয় খাদ্য বেশি পছন্দ করে, ম্যাশ বা পাউডার জাতীয় খাদ্য অপছন্দ করে। ছোট আকারের কবুতরের জন্য ২০-৩০ গ্রাম, মাঝারি আকারের জন্য ৩৫-৫০ গ্রাম এবং বড় আকারের জন্য ৫০-৬০ গ্রাম খাদ্য প্রতিদিন দিতে হবে। দানাদার জাতীয় খাদ্যের মধ্যে গম, ধান, ভুট্টা, সরগম, ওট শতকরা ৬০ ভাগ এবং লেগুমিনাস বা ডাল জাতীয় খাদ্যের মধ্যে সরিষা, খেসারি, মাশকলাই শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ সরবরাহ করতে হবে। কবুতরের ভিটামিন সরবরাহের জন্য বাজারে প্রাপ্ত ভিটামিন ছাড়া সবুজ শাকসবজি, কচি ঘাস সরবরাহ করা প্রয়োজন। প্রতিদিন ২ বার খাদ্য সরবরাহ করা ভালো। মাঝে মাঝে পাথর, ইটের কণা (গ্রিট) এবং কাচা হলুদের টুকরা দেয়া উচিত কারণ এ গ্রিট পাকস্থলীতে খাবার ভাঙতে এবং হলুদ পাকস্থলী পরিষ্কার বা জীবাণুমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

দেহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃদ্ধির জন্য প্রোটিন এবং শক্তির প্রয়োজনীয়তা

বয়স (সপ্তাহ)	প্রোটিন (গ্রাম/দিন)		শক্তি (কেজিজুল/দিন)
	শরীরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	দৈহিক বৃদ্ধির জন্য	
১ম দিন	০.০১	৫.৫৫	১.৪৫
১ম সপ্তাহ	০.০৭	১৪.৮৪	১০.২৪
২য় সপ্তাহ	০.১৭	১০.৭৪	২.৯৮
৩য় সপ্তাহ	০.২২	৪.৪৯	২৯.৮২
৪র্থ-শেষ সপ্তাহ	০.২৪	১.৫৮	৩২.৪৩

এছাড়া কবুতরের প্রয়োজনের সময় বা ডিম দেয়ার সময় গ্রিট মিশ্রণ বা খনিজ মিশ্রণ, ডিম এবং ডিমের খোসা তৈরি এবং ভালো হ্যাচাবিলিটির জন্য অতীব প্রয়োজনীয়।

খনিজ মিশ্রণ

(ক) বোন মিল (সিদ্ধ) : ৫%	(ঙ) লবণ : ৪%
(খ) ঝিনুক : ৪০%	(চ) চারকোল : ১০%
(গ) লাইম স্টোন : ৩৫%	(ছ) শিয়ান রেড : ১%
(ঘ) গ্রাউন্ড লাইম স্টোন : ৫%	

পানি সরবরাহঃ প্রতিদিন পানির পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে কবুতরকে দিনে ৩ বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা উচিত। কবুতর যেহেতু ঠোঁট প্রবেশ করিয়ে ঢোক গেলার মাধ্যমে পানি পান করে সেহেতু পানির পাত্র গভীর বা খাদ জাতীয় হওয়া উচিত। দুই সপ্তাহ পর পর পটাশ মিশ্রিত পানি সরবরাহ করলে পাকস্থলী বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

কবুতরের রোগ প্রতিরোধ করা গুরুত্বপূর্ণ। রোগ প্রতিরোধের জন্য কার্যকরি জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার নীতিমালাসমূহ মেনে চলতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনা

খামার হতে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনা বা খামারের জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বেশিরভাগ রোগই খামার ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খামার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করলে একদিকে যেমন বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে অন্য দিকে তেমনি মানসম্পন্ন বাচ্চা উৎপাদন হবে এবং অধিক লাভবান হওয়া যাবে। স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়গুলো নিম্নে তালিকাবদ্ধ করা হলোঃ

১। সঠিকভাবে সেড তৈরি করতে হবে যেন পর্যাপ্ত আলো প্রবেশ এবং বায়ু চলাচল করতে পারে।

২। উপরে বর্ণিত উপায়ে সঠিক মাপে খোপ তৈরি করতে হবে।

৩। কবুতর উঠানোর আগে খামারসহ ব্যবহার্য সকল যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে পানি দিয়ে পরিষ্কার করার পর পানির সাথে কার্যকরি জীবাণুনাশক (যেমন ০.২-০.৫% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড বা আয়োডিন দ্রবণ কোম্পানি কর্তৃক নির্দেশ মোতাবেক) মিশিয়ে খামারের সকল অংশে স্প্রে করতে হবে।

৪। সুস্থ সবল কবুতর সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজনে বাহ্যিক পরজীবী নিধনের জন্য ০.৫% ম্যালাথিয়ন দ্রবণে কবুতরকে গোসল করিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কবুতরের মুখ এ দ্রবণে ডুবানো যাবে না। হাত দিয়ে মাথায় লাগিয়ে দিতে হবে। অন্তঃপরজীবী প্রতিরোধের জন্য কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করাতে হবে।

৫। জীবাণুমুক্ত খাবার এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। বিশেষ করে খাবার যাতে কোনো অবস্থাতেই অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত না হয়। অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত খাবারের মাধ্যমে অ্যাসপারজিলোসিস ও বিষক্রিয়াসহ জটিল রোগ হতে পারে।

৬। কবুতরের খোপ, দানাদার খাদ্য ও খনিজ মিশ্রণ সরবরাহের পাত্র, পানির পাত্র ও গোসল করার পাত্র এবং কবুতর বসার স্ট্যান্ড নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

৭। খামারে মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতিবার খামারে প্রবেশ করার পূর্বে এবং খামার থেকে বের হওয়ার সময় হাত ও পা অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আয়োডিন যৌগ (আয়োডিন, পভিসেপ) বা কার্যকর জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে হবে।

৮। খামারে যাতে বন্য পাখি ও ইঁদুর জাতীয় প্রাণী প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেননা বন্য প্রাণী ও ইঁদুর দ্বারা রানীক্ষেত, মাইকোপ্লাজমা ও সালমোনেলাসহ গুরুত্বপূর্ণ রোগ খামারে আসতে পারে।

৯। শেড এবং খোপ নিয়মিত পরিষ্কার করে খামারের ভেতরের পরিবেশ অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে হবে।

১০। কোনো কবুতর অসুস্থ হলে দ্রুত আলাদা করে ফেলতে হবে। অসুস্থ বা মৃত কবুতর অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়ে কারণ জেনে অন্যান্য জীবিত কবুতরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১। খামারে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী মোকাবেলা করতে হবে।

টিকা প্রদান

খামারে রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কবুতরের প্রজননকালীন সময়ে প্যারেন্ট কবুতরগুলোকে রানীক্ষেত রোগের ইনএকটিভেটেড মৃত টিকা প্রয়োগ করা উত্তম। টিকা প্রয়োগের কমপক্ষে ৩ সপ্তাহ পর বাচ্চা ফুটানোর জন্য ডিম সংগ্রহ করতে হবে। তবে বাচ্চা কবুতর উড়তে শেখার সাথে সাথেও টিকা প্রয়োগ করা যায়। জীবিত বা ইনএকটিভেটেড মৃত উভয় টিকাই প্রয়োগ করা যায়। জীবিত টিকা চোখে এবং মৃত টিকা চামড়ার নিচে বা মাংসপেশিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম টিকা (জীবিত) প্রয়োগের কমপক্ষে ১৪ দিন পর দ্বিতীয় বা বুস্টার ডোজ দিতে হবে।

কবুতরের রোগবালাই

বিভিন্ন প্রকার রোগ জীবাণু দ্বারা কবুতর আক্রান্ত হতে পারে। সাধারণত খাদ্য এবং পানির মাধ্যমে জীবাণু কবুতরের দেহে প্রবেশ করে। তাছাড়া অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডাজনিত পীড়নের কারণেও অনেক সময় কবুতর দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। তাই কবুতরের খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে এবং গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে রোগবালাই অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কবুতরের সংক্রামক রোগসমূহের মধ্যে সাধারণত রানীক্ষেত, ইনকুশন বডি হেপাটাইটিস, বসন্ত, সালমোনেলোসিস, কক্সিডিওসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস এবং ছত্রাকজনিত রোগ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ভিটামিন বা খনিজ লবণের অভাবজনিত রোগ, বদহজম জনিত সমস্যা, গেঁটেবাত, অন্তপরজীবী যেমন কৃমি এবং বাহ্যিক পরজীবী যেমনঃ মাছি, উকুন ইত্যাদি দ্বারাও কবুতর আক্রান্ত হতে পারে। কবুতরের গুরুত্বপূর্ণ রোগ বালাইসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো-

রানীক্ষেত (Newcastle disease): Avian paramyxovirus ১ এ রোগের জন্য দায়ী। এ ভাইরাসটি সাধারণত খাদ্যযন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রান্ত করে। আক্রান্ত কবুতর থেকে সুস্থ কবুতরে এ রোগের জীবাণুর বিস্তার ঘটে। এ রোগে মৃত্যুহার শতকরা প্রায় ১০ ভাগ। মুরগির রানীক্ষেত রোগের ভাইরাসের এন্টিজেনিক বৈশিষ্ট্যের সাথে এ ভাইরাসের এন্টিজেনিক বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে।

সবুজ ডায়রিয়া বা টুথ পিকের মতো পায়খানা এবং প্যারালাইসিস ইত্যাদি এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হলে মাথা কাপুনি, পা এবং পাখা ঝুলে পড়া, ঘাড় বাঁকা করে উল্টানোর ফলে কোন কোনো সময় এক চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। শতকরা ২-৩ ভাগ কবুতরে প্যারালাইসিস দেখা দিতে পারে। রোগের লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে এবং ভাইরাস শনাক্ত করে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

কবুতরকে জীবিত বা ইনএকটিভেটেড/মৃত টিকা প্রয়োগ এবং খামারের জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

ইনক্লুশন বডি হেপাটাইটিস (Inclusion body hepatitis): ইনক্লুশন বডি হেপাটাইটিস কবুতরের একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। Avain adenovirus বা pigeon herpesvirus এ রোগের জন্য দায়ী। অসুস্থ কবুতরের বমির সাহায্যে এ রোগ খামারের অন্যান্য সুস্থ কবুতরে বিস্তার লাভ করে। আক্রান্ত পিতামাতা থেকেও এ রোগ বাচ্চা কবুতরে বিস্তার লাভ করতে পারে। এ রোগের মৃত্যুহার শতকরা প্রায় ৪০-১০০ ভাগ।

দুর্গন্ধযুক্ত বাদামি বা সবুজ ডায়রিয়া, ঝিমানো, খাবারে অনীহা, শুকিয়ে যাওয়া, বমি করা এবং হঠাৎ মারা যাওয়া ইত্যাদি এ রোগের লক্ষণ। রোগের তীব্র প্রকৃতির ক্ষেত্রে লালচে কাল কলিজা (লিভার) বা দীর্ঘ প্রকৃতির ক্ষেত্রে কলিজা শুকিয়ে যায় এবং খাদ্যনালীতে শেথ (ইডিমা) দেখা দেয়। কোন কোন সময় কলিজা, প্লিহা ও অগ্ন্যাশয়ে সাদা ফুটি ফুটি দাগ এবং কোষের নিউকিয়াসে ইনক্লুশন বডি পাওয়া যায়।

রোগের লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন, কোষের নিউক্লিয়াসে ইনক্লুশন বডির উপস্থিতি সর্বোপরি ভাইরাস শনাক্ত করে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

এ রোগের কোনো চিকিৎসা না থাকার দরুণ আক্রান্ত কবুতরকে দ্রুত সরিয়ে ফেলাই রোগের বিস্তার, রোধ এবং প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

বসন্ত (Pigeon Pox): Poxvirus নামক এক প্রকার ভাইরাস কবুতরের বসন্ত রোগের জন্য দায়ী। সাধারণত শরীরের পালকবিহীন অংশ যেমন- চোখ বা মুখের চারদিক, পা ইত্যাদি জায়গায় এ রোগের ফোস্কা বা গুটি দেখা যায়। আক্রান্ত কবুতরের চোখের পাতা ও চোখ ফুলে যায়, লাল হয়ে যায়, (conjunctivitis) এবং পানি পড়ে। ফোস্কা বা গুটিগুলো প্রাথমিক অবস্থায় ছোট থাকে কিন্তু পরবর্তীতে বড় হয়ে যাওয়ার দরুন অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে। যার ফলে খেতে না পেরে আস্তে আস্তে শুকিয়ে মারা যায়।

শরীরের পালকবিহীন অংশ যেমন- চোখ বা মুখের চারদিক, পা ইত্যাদি জায়গায় তৈরি হওয়া ফোস্কা বা গুটি দেখেই সাধারণত এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

কোনো চিকিৎসা না থাকার দরুন খামারের জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাই রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায়। আক্রান্ত কবুতরকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে উৎপন্ন হওয়া ফোস্কা বা গুটিগুলোকে প্রতিদিন কমপক্ষে তিনবার করে আয়োডিন যৌগ যেমন-পভিসেপ বা আয়োসান দিয়ে মুছে দিতে হবে। এতে ফোস্কা বা গুটি ফেটে জীবাণুর বিস্তার রোধ সম্ভব হবে।

সালমোনেলোসিস (Salmonellosis): সাধারণত গোত্রভুক্ত ব্যাক্টেরিয়া Salmonella spp. এ রোগের জন্য দায়ী। আক্রান্ত পিতামাতা থেকে ডিমের মাধ্যমে এবং খাবার, পানি, খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, কর্মরত শ্রমিক ও আগত অন্যান্য লোকজন, খাদ্য সরবরাহের গাড়ি, বন্যপ্রাণী যেমন ইঁদুর ইত্যাদির মাধ্যমে খামারে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এ রোগে শতকরা ৫-৫০ বা তারও বেশি কবুতর আক্রান্ত হতে পারে।

আক্রান্ত কবুতরের ডায়রিয়া, শুকিয়ে যাওয়া, পা এবং পাখায় প্যারালাইসিস এবং ডিম পাড়ার সমস্যা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। জেলির মতো, হলুদ বা সবুজ পাতলা পায়খানা করে এবং মারা যায়। পা এবং পাখার গিরা ফুলে যায় ও ব্যথা হয়। পেটের ভেতরে Peritoneal cavity ডিম জমা হয়ে Peritonitis দেখা দেয়। অনেক সময় পেটের ভেতরের প্রায় সমস্ত অঙ্গে ডিম লেগে থাকে। ডিমের ফলিকুলগুলোতে প্রচুর রক্তক্ষরণ দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন এবং ব্যাক্টেরিয়া সনাক্ত করে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। কার্যকরি এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য খামারে ব্যাক্টেরিয়ার প্রবেশ রুদ্ধ করতে হবে এবং আক্রান্ত কবুতর খামার থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

এসপারজিলোসিস (Aspergillosis): Aspergillus fumigatus নামক ছত্রাক মূলত এ রোগের কারণ। এ জীবাণুটি প্রধানত শ্বাসযন্ত্রকে আক্রান্ত করে তবে শরীরে ভেতরের অন্যান্য কলাকেও আক্রান্ত করতে পারে। ডিমের খোসার ভিতর দিয়ে এ রোগের জীবাণু ভ্রূণে প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া আক্রান্ত কবুতর থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস মাধ্যমে সুস্থ কবুতর আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে মৃত্যুহার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে।

শ্বাসকষ্ট, ঝিমানো, শুকিয়ে যাওয়া, খাবারের প্রতি অনীহা, ওজন কমে যাওয়া এবং ঘন ঘন পিপাসা পাওয়া ইত্যাদি এ রোগের লক্ষণ। আক্রান্ত কবুতরের ফুসফুসেছোট ছোট হলুদাভ গুটি দেখা যাবে এবং বায়ু কুঠুরী মোটা, ঘোলাটে এবং হলুদাভ হয়ে যাবে।

রোগের লক্ষণ: প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন এবং ছত্রাক শনাক্ত করে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। কার্যকরী ছত্রাক বিরোধী ঔষধ যেমন Amphotericin দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য আক্রান্ত কবুতর খামার থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

রক্ত আমাশয় (Coccidiosis): Eimeria গোত্রভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রটোজোয়া দ্বারা এ রোগ হতে পারে। এই জীবাণুগুলো সাধারণত খাদ্যনালীকে আক্রান্ত করে। সংক্রমিত খাবার, পানি বা লিটার থেকে মুখের মাধ্যমে জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। এ রোগে মৃত্যুহার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ।

রক্ত মিশ্রিত ডায়রিয়া, ক্ষুধামন্দা এবং ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি এ রোগের প্রধান লক্ষণ। আক্রান্ত কবুতরের খাদ্যনালীর বিভিন্ন অংশে রক্তক্ষরণ, রক্তমিশ্রিত অপাচ্য খাদ্য এবং আলসার বা ঘা দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ: প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন এবং পায়খানা বা খাদ্যনালীর ভেতরের দিকের অংশ নিয়ে পরীক্ষা করে প্রটোজোয়া সনাক্ত করে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। কার্যকরি প্রেটোজোয়া বিরোধী ঔষধ যেমন সালফারজাতীয় ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য আক্রান্ত কবুতর কার্যকরি জীবাণুনাশক দিয়ে শেড ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে এবং কঠোর জৈবনিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে।

ক্যাঙ্কার (Trichomoniasis): Trichomonas gallinae নামক এক প্রকার প্রটোজোয়া এ রোগের জন্য দায়ী। এ জীবাণুটি সাধারণত খাদ্যনালীর ওপরের অংশকে আক্রান্ত করে। আক্রান্ত বয়স্ক পিতামাতা কবুতর থেকে দুধের মাধ্যমে বাচ্চায় এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। আক্রান্ত জীবিত কবুতর সারাজীবন এ রোগের জীবাণু বহন করে। এ রোগে মৃত্যুহার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ।

আক্রান্ত কবুতর অস্থির থাকে, পাখা উস্কু খুস্কু হয়ে যায়, খাদ্য গ্রহণ কমে যায় এবং ধীরে ধীরে শুকিয়ে মারা যায়। আক্রান্ত কবুতরের মুখের চারিদিকে সবুজাভ বা হলুদ লালা লেগে থাকে এবং কোনো কোনো সময় ঠোঁট বেয়ে ফোটাঁ ফোটাঁ লালা পড়তে দেখা যায়। রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে কবুতরের মুখগহবর এবং গলাতে গোলাকৃতির ছোট ছোট গুটি দেখা যায়। পরবর্তীতে এ গুটিগুলো একত্রিত হয়ে বড় গুটিতে পরিণত হয়ে খাদ্যনালী আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ বন্ধ হয়ে যায়। একই রকমের গুটি মাথা, নাসিকা গহ্বর এবং কলিজাতেও দেখা যেতে পারে।

রোগের লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন এবং মুখ বা পাকস্থলী (ক্রপ) থেকে কলা নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা করে রোগের জীবাণু দেখে রোগ নির্ণয় করা যায়।

আক্রান্ত কবুতরকে দ্রুত দল থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ান এর পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে।

কবুতর বাজারজাতকরণ

কবুতর পালন একটি লাভজনক ব্যবসা। এটি কেবল ক্ষুদ্র এবং মাঝারি খামারিদের জন্য নয় বরং সুশীল সমাজের জন্য একটি বাণিজ্যিক শিল্প। কবুতর পালন বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে অনেক শহরে খামার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তবে এ সকল কবুতর বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সঠিক কোনো স্থান বা পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া কবুতরের বিশুদ্ধ জাত পাওয়ার বা কেনার কোনো বিশ্বস্ত উৎস বা মাধ্যম নেই। খামারিগণ তাদের উৎপাদিত কবুতর সাধারণত স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে থাকেন। তবে এ পদ্ধতিতে ন্যায্য মূল্য পাওয়া যায় না। ঢাকার কাটাবন, জিঞ্জিরা, টঙ্গী, গাজীপুর, ঠাটারিবাজার কবুতর ক্রয় বিক্রয়ের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এসব স্থানে বিভিন্ন শৌখিন জাতের কবুতর পাওয়া যায়।

উৎপাদনকারীর নিকট থেকে ভোক্তার নিকট দ্রব্য পৌঁছানোর জন্য একটি সুষ্ঠু এবং সুন্দর মাধ্যম গড়ে ওঠা উচিত। সাধারণত ২৮-৩০ দিন বয়সের কবুতর খাবার জন্য বিক্রয় করার উপযুক্ত হয়।

কবুতর পালনে আয় ব্যয়ের হিসাব

উন্নত বা শৌখিন জাতের কবুতরের ক্ষেত্রে

(ক) মূলধন বিনিয়োগঃ স্থায়ী খরচ

৩০ জোড়া কবুতরের দামঃ ৫০০০ × ৩০	= ১,৫০,০০০ টাকা (গড়ে প্রতি জোড়া ৫০০০ টাকা হিসাবে)
ঘর এবং যন্ত্রপাতি বাবদ	= ২০,০০০ টাকা
মোট খরচ	= ১,৭০,০০০ টাকা

(খ) খামার পরিচালনা খরচ

খাদ্য খরচ	= ১৭,০০০ টাকা
ঔষধ, টিকা ও জীবাণুনাশক বাবদ খরচ	= ৫০০০ টাকা
বিদ্যুৎ খরচ	= ১২০০ টাকা
অন্যান্য খরচ	**= ২০০০ টাকা**
মোট খরচ	**= ২৫,২০০ টাকা**

সর্বমোট খরচ (ক+খ) = (১,৭০,০০০+২৫,২০০) = ১,৯৫,২০০ (এক লাখ পচানব্বই হাজার দুইশত) টাকা।

(গ) আয়

১ জোড়া কবুতর প্রতি বছর গড়ে বাচ্চা দেয় ৫ জোড়া
সুতরাং ৩০ জোড়া কবুতর প্রতি বছর গড়ে বাচ্চা দেয় (৫ × ৩০) = ১৫০ জোড়া
বাচ্চার মোট বিক্রয় মূল্য (২০০০ × ১৫০) = ৩,০০০০০ টাকা (প্রতি জোড়া বাচ্চার দাম গড়ে ২০০০ টাকা)
বিষ্ঠার বিক্রয় মূল্য গড়ে প্রতি বছর = ৫০০ টাকা
মোট আয় = ৩,০০৫০০ (তিন লক্ষ পাঁচশত) টাকা
সুতরাং এক বছরে প্রকৃত লাভ = (৩,০০৫০০-১,৯৫,২০০) = ১,০৫,৩০০ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার তিন শত) টাকা

২। দেশী জাতের কবুতরের ক্ষেত্রে-

(ক) মূলধন বিনিয়োগ : স্থায়ী খরচ

৩০ জোড়া কবুতরের দামঃ ৮০ × ৩০	= ২৪০০ টাকা (গড়ে প্রতি জোড়া ৮০ টাকা হিসাবে)
ঘর এবং যন্ত্রপাতি বাবদ	= ২০০০ টাকা
মোট খরচ	= ৪,৪০০ টাকা

(খ) খামার পরিচালনা খরচ = ১,০০০ টাকা

সর্বমোট খরচ কে+খ) = (৪,৪০০+১০০০) = ৫,৪০০ (পাঁচ হাজার চারশত) টাকা।

(গ) আয়

১ জোড়া কবুতর প্রতি বছর গড়ে বাচ্চা দেয় ৬ জোড়া
সুতরাং ৩০ জোড়া কবুতর প্রতি বছর গড়ে বাচ্চা দেয় (৬ × ৩০) = ১৮০ জোড়া
বাচ্চার মোট বিক্রয় মূল্য (৫০ × ১৮০) = ৯০০০ টাকা (প্রতি জোড়া বাচ্চার দাম গড়ে ৫০ টাকা)
বিষ্ঠার বিক্রয় মূল্য গড়ে প্রতি বছর = ১০০০ টাকা
মোট আয় = ১০,০০০ (দেশ হাজার) টাকা

সুতরাং এক বছরে প্রকৃত লাভ = ১০,০০০-৫,৪০০ = ৪,৬০০ (চার হাজার ছয়শত) টাকা

কবুতর পালনের ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ

১. কবুতর মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়
২. কবুতরের মাংস সবাই খায় না
৩. কবুতর অসুস্থ হলে বাচাতে বেগ পেতে হয়
৪. ডিম এবং বাচ্চা বন্যপ্রাণী সাধারণত খেয়ে ফেলে

উপসংহার

বাংলাদেশে কবুতরকে সাধারণত শখের বা পোষা প্রাণী হিসাবে পালন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে কবুতর পালন করা হচ্ছে। কবুতরের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে কবুতর পালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক আয়ের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কবুতরের মাংস একদিকে যেমন প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ করছে, অন্যদিকে তেমনি অভাবগ্রস্থ মহিলা ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের একটি উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. রেজিয়া খাতুন, ড. জাহাঙ্গীর আলম এবং ড. মোঃ নজরুল ইসলাম